তাঁরা খুব বেশি বাস্তববাদী ছিলেন ও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের মৌলিক চাহিদা অপূরিত থাকলে, মানুষ শুধু ধর্মপালন করে বেঁচে থাকতে পারে না। অর্থাৎ মানবেতর জীবন যাপন করে আধ্যাত্মিক চর্চা করা অসম্ভব। যার পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, রোদবৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য মাথার উপর চালা নেই, তার কাছে খ্রীষ্টবাণী কী অর্থ বয়ে আনবে? তাই খ্রীষ্টবিশ্বাস লালনের পাশাপাশি তাঁরা এদেশের মানুষেব আর্থ সামাজিক, মানবিক ও বুদ্ধিগত উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। তাঁর নিরলস শ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়ন আনতে চেয়েছিলেন ও তা করতেও পেরেছিলেন। খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের মতো আন্দোলন বা জাগরণের মধ্য দিয়েই এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন।

ফাদার ইয়াং আমেরিকার মতো একটি ধনী দেশ থেকে মিশনারী হিসেবে সেবাকাজ করতে বাংলাদেশে এসেছিলেন (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে)। তখনও বাংলাদেশের জন্ম হয়নি। এদেশের খ্রীষ্টমণ্ডলীও সেসময় স্থানীয়ভাবে এতটা মজবুত হয়ে উঠেনি। খ্রীষ্টভক্তরাও ততটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেনি। শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিকভাবে তারা ছিল পিছিয়ে পড়া একটি জনগোষ্ঠি। মানুষ ছিল অভাবগ্রস্থ ও ঋণে জর্জরিত। বিবেকহীন সুদখোর মহাজনদের (কাবুলীওয়ালা) কাছ থেকে তারা উচ্চসুদের হারে ঋণ নিত। সেই ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে নানাভাবে তাদের জীবন বিপন্ন হতো। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারা হতো নির্যাতিত।

ফাদার চার্লস তাঁর প্রৈরিতিক সেবাকাজের একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন ময়মনসিংহ এলাকায়। সেখানে কাজ করার সময় তিনি মানুষের জীবনের চরম দারিদ্র্য অভিজ্ঞতা করেছেন। মানুষের দারিদ্র্য মোচনের জন্য কী করা যায় তা নিয়ে তিনি সর্বদা ভাবতেন। অস্থায়ীভাবে নানা পথও তিনি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি খুব বেশি কার্যকরী হয় নি কিংবা খুব স্থায়ীত্ব লাভ করেনি। তিনি মানুষকে নগদ টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করার বিষয়টি মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের স্বাবলম্বী হবার ইচছা থাকতে হবে এবং এরজন্য একটা স্থায়ী ব্যবস্থাও খুঁজে বের করা দরকার। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজেও অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়ী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। অবশেষে তাঁর মনের মধ্যে একটি শুভ বুদ্ধির উদয় হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমেই মানুষের দারিদ্র্য মোচন করা সম্ভব। তিনি এও অনুভব করলেন যে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের মতো কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে স্থায়ী উপায় নির্ণয় করা যাবে। কিন্তু তা করতে হলে দরকার প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ও বাস্তব জ্ঞান। তাছাড়া জনগণের মধ্যে গতিশীলতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সংঘবদ্ধতাও তৈরি করতে হবে। তবেই তারা তাদের এই দুর্দশাগ্রস্থ- অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করবে।

নিজের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বোধ ও নমুনা চিত্র তৈরি করে, গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে, এ বিষয়ে তিনি তৎকালীন আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনারের সাথে কথা বললেন। এই ধারণার সম্ভবনাময় দিকটিও তিনি আর্চবিশপের কাছে উপস্থাপন করলেন। প্রজ্ঞাপূর্ণ আচবিশপ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলেন। ফাদার ইয়াং-এর অদম্য উৎসাহ - উদ্দীপনা দেখে তিনি তাঁকে কানাডায় অবস্থিত নোভা স্কটিয়ার এ্যান্টিগোনিশএ, কোডি অব ইনস্টিটিউট অব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভর্সিটিতে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এ বিষয়ের উপর ১৯৫৩ সালে পড়াশুনা করতে পাঠালেন। নয় মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষ করে ১৯৫৪ সালে তিনি বাংলাদেশে (পূর্বপাকিস্থানে) ফিরে এলেন। অতপর তিনি এখানে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপনের উদ্যেগ গ্রহণ করলেন।

তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ঘুরে ঘুরে কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় সমিতি গঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, গঠন প্রক্রিয়া, পরিচালনা পদ্ধতি, বিভিন্ন নিয়ম কানুন, এর উপকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের মানুষকে শিক্ষা দিতে থাকেন এবং এই বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। বিশেষভাবে তিনি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার, শিকবৃন্দ, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদেরও শিক্ষা দিতে থাকেন। ফাদার ইয়াং - এর নিরলস চেষ্টায় ১৯৫৫ সালে ৩ জুলাই সর্বপ্রথম দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেটিড ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা, গঠন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।